

লোককথার শৈলী*

পল্লব সেনগুপ্ত

একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রথমেই বলে নিই : লোককথার শৈলী এই কথাটা কিন্তু একমাত্রিক নয়! তার কারণ লোককথার যে রূপ নিয়ে আমাদের ভাবনাচিন্তা করতে হয়, করে থাকি আমরা তা হল, তাদের লিখিত চেহারা সম্পর্কিত। অর্থাৎ, ‘লিটারেচার’ যার আবেদন কেবল মাত্র লিখতে-পড়তে জানে যে, তার কাছে। কিন্তু লোককথার জন্মকাল থেকে তার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত যে রূপটা আত্মপ্রকাশ করে, সেটা তাদের মৌখিক-চেহারা। যাকে বলে, ‘ওরেচার’। তাই বললাম যে, লোককথার শৈলী বিচার করতে হবে একমাত্রায় নয়, দু’মাত্রায়। কোনোও ক্ষেত্রে মাত্রার সংখ্যা আরও বেশি হয়ে থাকে। সেই কথায় পরে আসছি আমরা।

দুই

লোককথার বিভিন্ন শাখাগুলো যে কী কী, তা তো আমরা সকলেই জানি : মিথকথা- লোককাহিনি- কিংবদন্তি এগুলো তো প্রধান তিনটি ধারা। এদেরও আবার প্রত্যেকটিরই যে কম বেশি কয়েকটা করে উপধারা (বা উপশাখা) রয়েছে; যেগুলোর ঠিকুঝি-কুলুঝি-গাঁই-গোত্র নিয়ে এখানে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। যেমন অপ্রয়োজনীয় (এই ক্ষেত্রে) মিথকথার থেকে লোককাহিনির, এবং তার থেকে কিংবদন্তির ক্রম-অস্থিত চরিত্র বদল কেন হয়, কীভাবে হয়, কোন কোন উপাদানের যোজন-বর্জনের ফলে সেটা ঘটে সেই বিচার-বিশ্লেষণও। এই আলোচনায়, লোককথাকে সামগ্রিকভাবে ধার্য করে, তার সেই একাধিক মাত্রার শৈলীকে বিশ্লেষণ করতে প্রয়াস পাওয়া যাবে। ‘ওরেচার’ ই বয়সে ঢের বড় যেহেতু, তার প্রসঙ্গেই প্রথমে আসি বরং!... এই ‘ওরেচার’ বা মৌখিক সাহিত্যের আবির্ভাব কবে, তার ক্যালেন্ডার-মানা কোনও সন-তারিখ বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ব্যাপার যে সেটা, তা অবশ্য স্বচ্ছন্দেই বলে দেওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসের আমলের সেই কতশো প্রজন্মের পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীরা প্রবল বরফ-পড়া কিংবা অঝোরে বৃষ্টি-ঝরা রাতে গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে আগুনের চারপাশে গোষ্ঠীসুদু বসে সকলকে নানান সব কল্পকাহিনি শোনাতে। গল্পের জন্ম যে তখন হয়েছিল, তার হদিশ মেলে বিশ্বের বিভিন্ন পর্বতগুহায়, বিশ্বের মান্যতম গুহাশিল্প-তথা-আদিমতম শিল্পের পণ্ডিত অঁরি ব্রুইলের ‘ফোর হানড্রেড সেঞ্চুরিজ অব কেভ আর্ট’^১ বইতে যার অনেকবার খোঁজ মিলবে।

তো, এই যে আদিম গোষ্ঠীজীবনের গল্পবৈঠকগুলোর কথা বলছি সেখানে ঠাকুমা-দিদিমারা কী শুধুই গল্পগুলো বলে যেতেন স্থিরভাবে, বসে-বসে? হাত-পা না-নেড়ে, মুখ-চোখ-গলায় কোনও অভিব্যক্তি না প্রকাশ করে? টেপ-রেকর্ডারে কথা বলার মতন?..... স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি বলে যে, না তা হতো না। কেননা, দুনিয়ার সর্বত্রই লোককথার সংগ্রহ যাঁরা করেছেন, তাঁরা দেখেছেন যে প্রবীণরা গুচ্ছ-গুচ্ছ গল্প তাঁদেরকে শুনিয়েছেন, সেই শোনানোর অপরিহার্য কিছু অঙ্গ হল হাতের-পায়ের-মুখের-চোখের-গলার নানান ওঠা-পড়া, নড়া-চড়া, হেলা-দোলা! যা এককথায়

* Suniti Kumar Chatterji Memorial Lecture delivered on 30.08.2019 in Bengali at the Department of International Relations, Jadavpur University. The Lecture was organized by Kolkata Society for Asian Studies in collaboration with the School of Languages and Linguistics, JU, Kolkata.

অভিনয়! (এমন কিছু কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমারও আছে!).....এই রকমের বাঙ্খয়- অভিনয়ই পরম্পরাবাহিত হয়ে লোককথার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে অবাধ, অনাহতভাবে।

এখানে একজন সুপরিচিত লোককথা-সংগ্রাহক-সম্পাদকের কিছু কথা স্মরণ করা যায় খুব প্রাসঙ্গিকভাবে :

“Re-creation is an ideal theme for oral storytelling, because each telling re-performs earlier recitations in a new way— thereby opening possibilities for innovative interpretation. This is why all mythographers now accept *Claude Lévi Strauss's* principle that each myth is in fact constituted not by a core narrative, not by some essential meaning, but by the sum of all its re-telling. Myths— like the species of organisms— persist by evolving”.^২

তিন

ক্লোদ লেভি-স্ত্রোস মিথকথার প্রসঙ্গে যেটা বলেছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমস্ত ধরনের লোককথার প্রসঙ্গেই একান্ত মানানসই! সময়ের পলি কাহিনির উপকরণের স্তরে-স্তরে যেমন মিশে থাকে, তার বাচনীয় প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই তো ঘটে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মাস্তরে প্রবাহিত হবার সময়ে গল্পের চরিত্র ঘটনা- এই সবার যেমন চয়ন বর্জন সংযোজন হয়ে থাকে, তেমনটাই হয় তার বলার অভিব্যক্তিতেও। উপজীব্য গল্পের নানা নতুন ব্যঞ্জনা সেখানে গল্পের আশ্বাদনেও নতুনত্ব আনে। আর সেটাই হল লোককাহিনির সঞ্জীবনীসুধা; বিশল্যকরণী-স্বরূপ।

ওই বিশল্যকরণী শব্দটার অনুবাদেই মনে পড়ল, বাল্মীকি রামায়ণেই তো রয়েছে দন্ডকবন থেকে ভারাক্রান্ত মনে ভারতের ফিরে-আসার পর, তাঁর মনকে প্রফুল্ল করার জন্য কৈকেয়ী অযোধ্যার রাজপুরীতে ডেকেছিলেন জীবিকার্থী ‘আলাপিনী’দের, যাঁরা এসে নানা ভঙ্গীতে নানা গল্প বলে শোনাচ্ছেন ‘প্রিন্স রিজেন্ট’ তথা যুবরাজ রামের প্রতিভূস্বরূপ রাজপরিবারের সেজ ছেলেকে! তার মানে, ভারতকে। ‘নানা ভঙ্গীতে গল্প বলা’ এই কথার সূত্রেই, এতক্ষণ যা বলছিলাম তার প্রাচীন ভারতীয় সাক্ষ্য মেলে।

ভঙ্গীসহ কাহিনি বলার যে ব্যাপারটা বারবার উল্লেখ করছি, সেই ভঙ্গিমাগুলো কেমন?.... গোড়াতেই বলে রাখি: দেশ-কাল-জাতি-সংস্কৃতির ভেদে ওইসব ভঙ্গিমার সৃষ্টি হয়; অবশ্য বিশ্বজনীন ভঙ্গিমাও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যায়। লোককথার আবেদনে একটা বিশ্বজনীন অনুভবও যে থাকেই, এটা তারই দ্যোতক। ভারতের বিভিন্ন ধ্রুবপদী নৃত্যকলায় বিভিন্ন মুদ্রা যেমন প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে, কাহিনি বলার ভঙ্গিমারও ঠিক সেই ধরনেরই সঙ্কেতবাহী। নাচের মুদ্রার নীরব-কিন্তু দৃষ্টিগোচর ভাষা যেমন তারাই বোঝে যারা সেগুলোর অবলীন সঙ্কেতগুলোর অর্থ জানে, লোককথার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক তেমনই। তবে সহজবোধ্য কিছু সঙ্কেত বা ভঙ্গীও আছে অবশ্যই। সেগুলো সবাই বোঝে।

দূরপ্রেক্ষণের নানা চ্যানেলে মাঝে মাঝেই একটা বিজ্ঞাপন দেখা যায়; বোধহয় সবাই দেখেছেন। ইস্কুলের ক্লাসে এক দিদিমণি ছোট ছোট বাচ্চাদের একটা গল্প বলছেন: “বিরা—ট একটা গাছ” এইটুকু বলেই তিনি গাছের ডালের মতো নিজের হাতদুটো ছড়িয়ে দিলেন, যাতে ক্ষুদে শ্রোতার দল সত্যিই একটা বড়সড় গাছের চেহারার আভাস খুঁজে পায়! আর ওই “বিরাট” শব্দটার উচ্চারণেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়- “বিরা” বলার পরে “রা” এর আ-কার উচ্চারণটাকে খানিকদূর টেনে নিয়ে গিয়ে তবেই “ট” উচ্চারণ করা হল। ওই ‘আ’ এর লম্বা টানটাই গাছের বিরাট-ত্বের ব্যঞ্জনা বোঝাচ্ছে!..... ঠিক এই ব্যাপারটাই হয় লোককথা শোনানোর সময়ে। ওটাই হলো তার ‘কথা বলার শৈলী’: ওরেচার স্টাইলিস্টিক্স।

অর্থাৎ, লোককথা বলার সঙ্গে বিশিষ্ট কিছু ভঙ্গিমাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ফলে, অনেক সময়েই ব্যাপারটা প্রায় একক-অভিনয়ে পরিণতি লাভ করে। গল্পে যখন রাজপুত্রের ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার বর্ণনা আসে, তখন ঘোড়ার দৌড়ের “টগ্‌বগ টগ্‌বগ” শব্দ গলায় যেমন থাকে, ঠিক তার সঙ্গে-সঙ্গেই দু-হাতে লাগাম তুলে ঝাঁকানোর ভঙ্গিমাও হয় অনিবার্য। রান্স এসে সানুনাসিক স্বরে “হাঁউ-মাউ-খাঁউ” যখন বলে, তখনই কথকের চোখদুটো বড়-বড় করে, ভয় দেখানোর মুখভঙ্গিমা করে ঘটনাকে দৃষ্টিগ্রাহ্যও করে তোলা হবে অবশ্যই! রান্সের মুখের “মানুষের গন্ধ পাঁউ” বলার সময়ে কথকের নাক সিঁটকে চোখের মধ্যে একটা উৎসুক চাহনি সৃষ্টি করে সত্যিসত্যিই যেন গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে! মানুষটাকে খোঁজা হচ্ছে এমন একটা অভিনয়ও করতে হয় কথককে। তার মানে, বিশেষ বিশেষ কিছু চরিত্র, বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ঘটনা, বিশেষ বিশেষ কোনও কোনও প্রাণীর উল্লেখ এনে, প্রাসঙ্গিক ভাবটুকু প্রকাশের প্রয়োজন হলে মুখ-চোখ-নাক-হাত-পা ইত্যাদিকে যথাযথ ভাবে সঙ্কেতবদ্ধ করে ব্যবহারও করতে হবে কথককে।

চার

মাদাম ভিনকুরোভা ছিলেন সাইবেরিয়ার এক প্রখ্যাত লোককথা-বলিয়ে!^৪ আজাদোভস্কি, বিজুকোভ, সকোলভ-প্রমুখ বিশিষ্ট রুশি লোকসংস্কৃতির পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই তাঁর গল্পবলার অনবদ্য বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশংসা করেছেন। রুশীয় বীলিনাগুলি (লোককাহিনি) তিনি যখন শ্রোতাসমাবেশে বলতেন, তখন না কি তাঁর বাচনদক্ষতা এবং অভিনয়ধর্মিতার কৃতিত্ব এমনভাবে মিশে যেত যে, পুরোপুরিভাবেই যেন একটা কাহিনি সেখানে ‘অভিনীত’ হয়ে যেত। মুর্শিদাবাদের ‘কহানি’ কথকদের উপস্থাপনা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সম্ভবত এই কথাটার মর্ম গ্রহণ করতে স্বচ্ছন্দ হবেন। বিখ্যাত লোকগায়িকা তিজ্জন বাইয়ের ‘পান্ডবানি’ অনুষ্ঠান পরিবেশনের যাঁরা শ্রোতা-দর্শক হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন কীভাবে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনি গান গেয়ে শোনানোর সময়ে ঘটনা ও চরিত্রকে কেমন করে তিনি বিভিন্ন রকমের ভঙ্গিমার মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলেন! আফ্রিকান-আমেরিকানদের লোক-কাহিনিগুলির কিছু একান্ত নিজস্বতা আছে শব্দের উচ্চারণের (তথা অঙ্গভঙ্গিমারও) ফলে শ্রোতাসমাবেশে যখন সেগুলি হাজির করা হয়, তখনও অনেকটা ওই একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে আফ্রো-আমেরিকান লোকসংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদেরও।

আসলে অঙ্গভঙ্গিমা সহ লোককথার উপস্থাপনা এমনই একটা অভিকরণ-কলা, যাকে বিশ্বজনীন বলেই মানতে হয়। আর সেই জন্যেই এন্টি আর্নে এবং স্টিথ টমসনের ‘দ্য টাইপজ অব ফোকটেল’ বইতে^৫ এই ব্যাপারটাকে একটা বিশেষ ধরনের প্রকরণ (টাইপ) হিসেবে ধার্য্য করেছেন : ৯২৪। এখন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, ১৯ শতকের গোড়ার দিকে তো বটেই এমন কি মাঝামাঝি সময়েও কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদি অধিবাসীরা (যাঁদেরকে কিছুটা বিশ্রাস্তিসূচকভাবেই ‘রেড ইন্ডিয়ান’ বলা হয়ে থাকে) শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা চালাতে পারতেন। এই অধিজাতিগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা ছিল, তাই বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীগুলির মানুষেরা যখন একে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতেন তখন ওই অঙ্গভঙ্গির ভাষাই হতো তার মাধ্যম। এটাকে ‘শুধুমাত্র কোড ল্যান্ড্‌য়েজ’ বা সঙ্কেতিক ভাষা হিসেবেই গণ্য করা হতো না; এই সব ভঙ্গিমার ভাষায় গল্প-টঙ্গ ও বলা হতো, যার দু চারটের খোঁজ এখনও মিলবে যেসব জাতিতত্ত্ববিদরা ওই গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের কারুর লেখায়। এমন কিছু ‘কাহিনি প্রদর্শন’ সঙ্কলিত হয়েছে গ্যারিক ম্যালেরির লেখা ‘ইন্ট্রোডাকশ্যন টু দ্য স্টাডি অব সাপ্পিন ল্যান্ড্‌য়েজ অ্যামং দ্য নর্থ আমেরিকান ইন্ডিয়ানস’ বইটিতে^৬। সৌগত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত ‘লোককথার বর্ণমালা’ (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০১৪) গ্রন্থে ওই বই থেকে নিয়ে এমনই একটি গল্প অনুবাদ ও বিশ্লেষণ করেছেন আমার ছাত্রী ড. অর্পিতা বসু ‘লোককথার অঙ্গভাষা : একটি রেড ইন্ডিয়ান গল্প’ নামে^৭।

পাঁচ

গিলবার্ট কিথ চেস্টারটন তাঁর বিখ্যাত ‘দ্য ক্লাব অব কুঅ্যার ট্রেডস’ বইতে^৬ জুলুদের (দক্ষিণ আফ্রিকার আদি আধিবাসী) ভাষা নিয়ে গবেষণারত এক আধক্ষেপা পণ্ডিতের সঙ্গে এক প্রবীণ জজ সাহেবের নৃত্যের মাধ্যমে গভীরভাবে আলোচনারত থাকার আপাতভাবে গভীর কিন্তু পরিহাসে টইটশুর বর্ণনা দিয়েছেন। অধ্যাপক মশাই প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, জুলুরা অতি প্রাচীন কালে মৌখিক নয় আঙ্গিক ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করতেন! সেই ভাষায়, প্রেম-ভালোবাসা, রাগ-মান, আশীর্বাদ-অভিশাপ, প্রার্থনা-দাবী ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপার চলত কাজে কাজেই গান-গল্প-প্রবাদ ইত্যাদিরও মাধ্যম ছিল যে সেটাই, এমনই বুঝতে হবে!... চেস্টারটন, পরিহাস করে ঘটনাটা লিখলেও তার মধ্যে কিন্তু সত্যতার জড় আছে। এমন ব্যাপারটা বহু আদিম তথা প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও কম বেশি চলে/ চলত এরকম উল্লেখ বিশ্বের নানা দেশে গবেষণারত জাতিতত্ত্ব- নৃতত্ত্বের পণ্ডিতরাই মনে করেছেন। সব রকম নির্বাক প্রতিবেদনই যখন ওই অঙ্গভঙ্গিমার দ্বারা সম্ভবপর তাহলে গল্প বলাটা কি আর তা থেকে বাদ পড়তে পারে!

ওরেচার-স্টোরির প্রসঙ্গটা শেষ করার আগে তার আঙ্গিক শৈলীর বিষয়ে একটা সুস্থিত সিদ্ধান্তে আসা দরকার। গল্পের ওঠাপড়া এবং ঘটনা ও চরিত্রের উপরে আলোকপাতের প্রয়োজনে শ্রোতার কান এবং চোখ দুটোই দখল করতে হলে, কথক তথা প্রদর্শককে সচেতন থাকতে হয়, যাতে প্রতিটি ভাব ও ভাবনার জন্য সঠিক শৈলীটি প্রযুক্ত হয়। সেই অঙ্গশৈলী অবশ্য দেশ-কাল-জাতি-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপস্থাপিত হয়। সেই অঙ্গশৈলীর কিছুটা অবশ্য এখনো দজ্জাল রূপে প্রখ্যাতা কোনও কোনও প্রবীণারা ধরে রেখেছেন, যখন তাঁরা টিটকিরি-টিপ্পনী সহযোগে প্রয়োজনমায়িক প্রবাদবচন আওড়ান ছড়া কেটে, বা না-কেটে তখনই সেটা উদ্ঘাটিত হয়।

এটা মনে রাখতে হবে যে প্রবাদ মানেই কিন্তু কোনও একটা গল্পের বিশেষ চরিত্র বা বাস্তব ঘটনা-নির্ভর সারাৎসার! তাই মূল ঘটনার বা চরিত্রের সঙ্গে তুলনীয় কোনও কিছু দেখলে-শুনলে প্রবাদের প্রয়োগ হয়; এবং সেই প্রয়োগ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রতিবেদিত করার সুবাদেই ওই ভঙ্গিমা। মূল গল্পটা তখন পরোক্ষে থাকলেও, ওই ভঙ্গিমাগুলোই তার আদি ব্যঞ্জনাতে পুনরুজ্জীবিত করে দেয়।

লোককথাকে যখন ভঙ্গীসমেত বলা হয়, তখন মূলত তিনটি বর্গের ভঙ্গিমা তাতে ব্যবহৃত হয়: ১) ধর্মকেন্দ্রিত, অলৌকিকতা কেন্দ্রিত এবং ধর্ম-বিরহিত অর্থাৎ ‘সেক্যুলার’ কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। ২) চারিত্রিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রিত, ৩) মনের আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্রিত এবং ঘটনার অনুভূতিকে কেন্দ্রিত। গল্পের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই এগুলি প্রযুক্ত হয়। এরকম অসংখ্য ভঙ্গিমা যে হয় এবং দেশ কাল সংস্কৃতি পাত্রপাত্রী ভেদে তার সংখ্যা আরও বাড়ে এ তো সহজবোধ্য। দু’চারটে উদাহরণ হিসেবে বলি বরং: ‘হাতের বুড়ো আঙুল তুলে কাঁচকলা দেখানো’ (গল্পে একজন আরেকজনকে বঞ্চিত করে সানন্দে যখন সেটা ব্যক্ত করে), আবার বিদেশি, বিশেষত আমেরিকান গল্পে ওই রকম বুড়ো আঙুল দেখানোর অর্থ, ‘ঠিক আছে সব’। (হোয়াটস্যাপ, ফেসবুক ইত্যাদির সুবাদে এই চিহ্নটি এখন ব্যাপকভাবে পরিচিত)। গল্পে একজন আরেকজনকে শাপমনি করছে যখন, তখন হাতের আঙুল মটকানোর ভঙ্গি করা, কোনও কিছুতে ‘ঘেন্না’ বোঝাতে হচ্ছে যখন, তখন কথকের নিজের নাক কুঁচকানো; ভয়ঙ্কর কিছু দেখছে যখন গল্পের মধ্যে তখন দু’চোখ বড়-বড় করে মুখে ভয়ের ভঙ্গীই ফোটাবেন সেই কথক; রাগ বোঝাতে চোখ পাকানো হয় বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কথককে মুখেও রাগ ফোটাতে হয়!... এ ধরনের ভঙ্গিমা তো অসংখ্য। সংস্কৃতি-নির্বিশেষে বেশ কিছু নিজস্ব ভঙ্গিমাও থাকে - সেই সংস্কৃতিতে বহুমান লোককথাতেই সেগুলি দেখা যায়। যেমন ‘বিস্মিত হওয়া’

বোঝাতে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে ‘গালে হাত দেওয়া’ মেয়েদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। বিশ্বজনীন কিছু ভঙ্গিমা, যেমন খিদে পেয়েছে বোঝাতে ‘হাঁ করা মুখের কাছে ডান হাতের মুঠো তোলা’, কিংবা ‘কিছু প্রার্থনা করা হচ্ছে’ বোঝাতে ‘দু- হাতের পাতা একে অপরের সঙ্গে জোড়া করে বিছানো’ এগুলোও তো আছেই”।

ছয়

ওরেচার এখন অবশ্য গ্রস্ত হয়ে চলেছে লিটরেচারের দ্বারা। তাই লোককথার বাচনিক শৈলী নিয়ে আলোচনা করাটা এখন বেশ কঠিনসাধ্য। অথচ সেটা কিন্তু একান্তই জরুরি; কারণ কালে দিনে ওই বিশিষ্ট অভিকরণ মাধ্যমটি বিলুপ্তই হয়ে যাবে হয়ত একেবারে। প্রাচীন ভারতের ‘কথাক্বাড়’ কিংবা ‘আলাপিনী’ রা এখন তো সবাই বিস্মৃতি-বিলগ্ন। ‘কহানি’-বলিয়েরাও ‘এনডেঞ্জারড স্পিসিজ’! প্রায় বিলুপ্তির মুখে। এমন এক পরিপ্রেক্ষায় এটা নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার কথাটা সেজন্যই খুব জরুরি। নাহলে ‘অরণ্যদেব’ ‘টিনটিন’ আর ‘অ্যাস্টেরিক্সের’ ব্যাপক উপস্থিতিতে, বিপদ যে ঘনীভূত।

সাত

লোককথার লিখিত রূপের শৈলী নিয়ে চর্চা খুব বেশি না হলেও, এই বিদ্যাশৃঙ্খলার অনেক পণ্ডিতই কথা-বস্তু বিশ্লেষণের বেশ কিছু পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন যেভাবে, সেগুলি থেকে উপকরণ বেছে নেওয়া যায় এবং তার মাধ্যমেও গল্পের শৈলীগত অর্থ বিচার করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ করব অ্যাক্সেল ওলরিকের নির্দেশিত ন-টি নিয়মের কথা, যেগুলি সচরাচর ‘এপিক ল্য’ বা ‘ওলরিক’স ল্য’ বলে উল্লেখিত হয়।^{১০} ওলরিক অসংখ্য লোককাহিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এই-এই ব্যাপারগুলো প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ ‘ল্য অব বিগিনিং’, ‘ল্য অব ক্লোজিং’, ‘ল্য অব রিপটেশ্যন’, ‘ল্য অব টু’, ‘ল্য অব থ্রি’, ‘ল্য অব ফোর’, ‘ল অব কন্ট্রাস্ট’, ‘ল্য অব ইম্পার্ট্যান্স অব ইনিশিয়েল পজিশন’, ‘ল্য অব ফাইনাল পজিশন’। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ওলরিক এই যে বিধিগুলি লোককথায় প্রাপ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন তাঁকে পরবর্তীকালে স্টিথ টম্পসন বিশ্বজনীন পরিপ্রেক্ষায় পুনঃস্থাপন করেছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী : ক) লোককাহিনিতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ঘটনাটি গল্পের মুখপাতে বলা হয় না, গল্পের শুরু এবং সারা দুটিই ধীর লয়ে ঘটে। খ) একই বা অনুরূপ ঘটনার (ভাবে কিংবা রূপে) পুনরাবর্তন তিন চার বার হতে পারে এবং তার গল্পে ‘সাসপেন্স’ বা উদ্বেগ সৃষ্টি হবে। গ) কাহিনির সমস্ত স্তরেই প্রধানত সক্রিয় থাকে দুটি চরিত্র, কখনও বা তিনটিও; অন্যরা ঘটনাস্থলে থাকলেও মূলত তারা থাকে নিষ্ক্রিয় হয়েই। ঘ) সব সময়ে লোককথায় ঠিক বিপরীত প্রবণতার বা চরিত্রের লোকই পরস্পরের বিরোধী বা প্রতিস্পর্ধী হয়। ঙ) একই ধরনের চরিত্র যদি কাহিনিতে দুটি থাকে তা হলে দুটিই নগণ্য বা স্বল্পক্ষম বা পার্শ্বচরিত্র বলে গণ্য হবে। চ) সবচেয়ে ছোট বা দুর্বল বা বঞ্চিত হয়ে যে থাকে কাহিনির বৃহদংশে, পরিণামে সেই হয় সফল। ছ) চরিত্রগুলির যে সব দোষগুণ কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে সেগুলিই শুধু বর্ণিত বা ব্যাখ্যাত হয়; সেগুলি ছাড়া অন্যান্য চরিত্র লক্ষণ যদি কিছু থাকেও, গল্পে তারা অপ্রাপ্য। জ) চরিত্রের মতোই ঘটনাগুলির সংস্থানও খুব সরল হয়, এক বা একাধিক উপকাহিনি থাকলে সেগুলি একে অন্যের অনুবর্তী হয় - কখনওই কিন্তু সমান্তরালভাবে একই সঙ্গে ঘটে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করে না। ঝ) লোককথার বর্ণনায় জাতীয় বা অঞ্চলকেন্দ্রিত সংস্কৃতির নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি ইত্যাদি অবিমিশ্রভাবে প্রকাশিত হয়। বিশ্বজনীনতা যদি থাকেও, তা ভাবগত ক্ষেত্রে অভিব্যক্তিতে নয়।

আট

ওলরিক মূলত তাঁর স্বদেশভূমি ডেনমার্কের ‘ভোকসডিখটুং’ (লোককাহিনি) এর বিরাট সম্ভারকে ছেঁকে-ছেঁনে নিয়ে যে নিয়মনবক নির্দেশ করেছেন, পরবর্তীকালে সেই দেশীয় গভীবদ্ধতার থেকে মুক্ত করে সেগুলিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আরও বহু লোককথার সহযোগে বিশ্লেষণ করে, লৌকিক গল্পকথার শৈলীনির্ণয়ের জন্য এই পরিশীলিত ৯-টি বিচার্য উপকরণকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। এই নির্দেশনার পরেও যেটা বিশেষ করে বুঝতে হবে, তা হল : এক) লোককাহিনিতে একটি চরিত্রই সর্বপ্রধান হয় পরিণামে। তার প্রতিস্পর্শী কিংবা সহযোগী চরিত্রগুলি তখন পিছনে চলে যায়, এবং দুই) সমস্ত গল্পটারই একটা কাঠামোগত ঐক্য থাকে সেখানে উপকাহিনি, শাখাকাহিনি, যদিও থাকে তারা পরিশেষে মূল কাহিনির ধারাস্রোতে বিলীন হয়ে যায়।

লোককথার শৈলীবিচারের পদ্ধতির এই মূল কাঠামোটি কোথায়, কতখানি অনাহত থাকে, তার তন্নিষ্ঠ সন্ধান করার জন্য ক্রমিক উদ্বর্তনে অক্ষনির্ভর কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, যাদের মধ্যে অ্যান্টি আর্নে এবং স্টিথ টম্পসন নির্দেশিত টাইপ নির্ণয় পদ্ধতি বিভিন্ন লোকগল্পের গোত্রলক্ষণ যে কী সেইটে দেখে। টম্পসনের মোটিফ নির্ণয় পদ্ধতির (তারা সংখ্যায় অজস্র এবং তাদের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে) সাহায্যে গল্পের ঘটনা এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী কী, তা উপলব্ধি করা যায়। ভ্লাদিমির প্রপ রুশীয় বীলিনার সম্ভার খতিয়ে-যাচিয়ে দেখে ৩১ টি ফাংশনাল ইউনিট বা সক্রিয়মূল একক নির্দিষ্ট করেছেন সেগুলি চিহ্ননির্ভর।^{১১} উত্তরকালে, সেই একদেশজ পদ্ধতিও বিস্তৃতি লাভ করেছে; বহুক্ষেত্রেই প্রতিটি সংস্কৃতি-বলয়ে তাদের একান্ত নিজস্ব কাহিনিগুলির নিজেদের সমাজ ও কৃষ্টিকলার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই ওই রকম আরও নানা ধরনের ‘ফাংশনাল ইউনিট’ উপস্থাপিত করে চলেছে। আমাদের বাংলা লোককথাতেও ২৮৩ ফাংশনাল ইউনিটের সন্ধান মিলেছে ১৬১৪ টি গল্পকে বিশ্লেষণের অণুবীক্ষণে ফেলে। ‘বাংলা লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’ গ্রন্থে^{১২} আমার ছাত্রী ড. রীতা ঘোষ এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

নয়

গল্পগুলো গড়ে ওঠে ওই ফাংশনাল ইউনিটগুলিকে প্রয়োজন মাফিক ক্রমিক ভাবে সাজানোর মাধ্যমে। আর সেই সাজানোটাই হল লোককথার শৈলী। দুটো লোককথার উদাহরণ দেখিয়ে অতঃপর আলোচনাটা সাঙ্গ করব। একটা বিদেশি : ‘ম্নো হোয়াইট আর সাত বামন’,^{১৩} অন্যটা আমাদের একান্ত নিজস্ব রূপকথা, ‘পাতালকন্যা মণিমালা’^{১৪}।

বিদেশি গল্পটা দিয়ে শুরু করি (আশা করছি, গল্পটা সবারই জানা আছে, তাই ফাংশনাল ইউনিটগুলোই পরপর সাজিয়ে নিচ্ছি, কীভাবে ওটা গড়ে উঠেছে সেটা বোঝাতে) :

- ১। শয়তানি রানি মৃত্যু সতিনের মেয়ে ম্নো-হোয়াইটকে প্রাসাদ থেকে তাড়াল;
- ২। রাজকন্যাকে ঘাতক দিয়ে সে খুন করাতে চেষ্টা করল;
- ৩। ঘাতক মায়ার বশে সেটা করল না;
- ৪। জঙ্গলের মধ্যে ম্নো-হোয়াইটের সঙ্গে সাত বাঁটুলের দেখা হল;
- ৫। তারা তাকে আশ্রয় দিল;
- ৬। জাদু আয়নায় রানি সেটা দেখল;

- ৭। রাজকন্যাকে মেরে ফেলবার জন্য রানি এটা সেটা বিক্রির উদ্দেশ্যে ৩ বার ৩ জনকে ফেরিওয়ালি সাজিয়ে পাঠাল তার জঙ্গলের বাড়িতে।
- ৮। পরপর ৩ বারই সে প্রাণ ফিরে পেল ২ বার বাঁটুলদের সাহায্যে, শেষবার এক রাজপুত্রের সাহায্যে;
- ৯। ৩ বারই রানি জাদু আয়নার মারফতে সে খবর জানতে পারল;
- ১০। রাজপুত্র স্নো-হোয়াইটকে বিয়ে করল;
- ১১। আয়নায় সেই ছবি দেখে রানি হিংসেয় ফেটে মারা গেল।
একটু অনুধাবন করলেই, ওলরিক (এবং পরে টম্পসন) কাহিনির বিন্যাসের জন্যে যে সূত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন, তার সঙ্গে গল্পটার ক্রমিক সাজানোর শৈলীটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
এবারে মণিমালার রূপকথাটার ফাংশনাল ইউনিটগুলো বিচার্য :
- ১। দেশভ্রমণে বেরিয়ে রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্র একটি বিশালায়তন অজগর সাপকে মেরে তার মাথার মণিটি পেলেন;
- ২। মণি হাতে রাজপুত্ররা সরোবরে নাইতে নামলে, মণির স্পর্শে জল দু-ফাঁক হয়ে গেল, দুজনে পাতালপুরীতে পৌঁছে নাগলোকের রাজকন্যা ঘুমন্ত মণিমালাকে দেখলেন;
- ৩। রাজপুত্রের হাতের ওই মণি মাথায় ঠেকাতেই তাঁর ঘুম ভাঙল;
- ৪। রাজকন্যা-রাজপুত্রের গান্ধর্বমতে বিয়ে হল;
- ৫। মন্ত্রিপুত্র স্বদেশে ফিরলেন একাই;
- ৬। মণিমালা একবার এক সরোবরের তীরে উঠে এলে সেই রাজ্যের রাজপুত্রের চোখে পড়লেন;
- ৭। তাঁকে কোনওমতে এড়িয়ে মণিমালা ফের পাতালপুরীতে ফিরে গেলেন;
- ৮। পেঁচোর মা দূর থেকে ব্যাপারটা দেখল;
- ৯। ২য় রাজপুত্র মণিমালার জন্য দুঃখে শয্যা নিলেন;
- ১০। রাজা তাঁর ছেলের যে এসে আরোগ্য করতে পারবে তার হাতেই অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাকে দেবার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন;
- ১১। পেঁচোর মা রাজার কাছে গিয়ে তাঁকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে বিশ্বাস করাল যে, সে আর তার ছেলে পেঁচোই সেটা পারবে;
- ১২। সরোবরের ধারে গিয়ে একদিন পেঁচোর মা মণিসহ মণিমালাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাজপ্রাসাদে এনে আটকে ফেলল;
- ১৩। ২য় রাজপুত্রের অসুখও সেরে গেল তখনই আর মণিমালার সঙ্গে তাঁর বিয়ের তোড়জোড় হতে লাগল;
- ১৪। ব্রত পালনের অজুহাতে মণিমালা বিয়েটা একটা বছরের জন্য ঠেকিয়ে রাখলেন;
- ১৫। এদিকে মন্ত্রিপুত্র দেশ থেকে ফিরে বারবার খুঁজেও কিন্তু রাজপুত্র এবং মণিমালার দেখা পেলেন না;
- ১৬। রাজ্যের লোকের মুখে সব ব্যাপারটা শুনে মন্ত্রিপুত্র গেলেন পেঁচোর মায়ের কাছে তার হারানো পেঁচো সেজে;
- ১৭। পেঁচোর মা-ও তাঁকেই পেঁচো ভেবে আনন্দের চোটে মণিটা দিয়ে দিল;
- ১৮। রাজার প্রতিশ্রুতি অনুসারে নকল পেঁচো ওরফে মন্ত্রিপুত্রের সঙ্গে সে দেশের রাজকন্যার বিয়ে হল এবং যৌতুক হিসেবে অর্ধেক রাজত্বও দেওয়া হল;
- ১৯। বউকে মন্ত্রিপুত্র সব জানালে, তিনিও রাজি হলেন মণিমালার সঙ্গে ১ম রাজপুত্রের পুনর্মিলনে সাহায্য করতে;

- ২০। মণিমালাকে রাজকন্যা সেই নাগমণি দিলেন স্বামীর কাছ থেকে নিয়ে;
- ২১। বর্ষান্তে ব্রতোদযাপনের ছুতোয় মণিমালা মন্ত্রিপুত্র আর রাজকন্যাকে নিয়ে সরোবরে নাইতে গেলেন;
- ২২। পাতালপুরীতে গিয়ে নাগপাশে বন্দী স্বামীকে মুক্ত করলেন মণিমালা;
- ২৩। দুই বন্ধু যে যার বউকে নিয়ে নিজের নিজের রাজত্বে ফিরে গেল।

দশ

এই রূপকথার মধ্যে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যারা এ-কাহিনির সক্রিয়মূল একক। যেমন, নাগমণির অলৌকিক ক্ষমতা; রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্রের সৌহার্দ্য; ব্রতপালনের ছুতোয় ‘পরপুরুষের’ হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা; রাজার মর্জিতে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাকে লাভ করা; স্বামীর কথায় নিজের বাবা এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে যাওয়া- ইত্যাদি, ইত্যাদি। আসলে, ‘স্নো-হোয়াইট অ্যান্ড সেভেন ড্যোয়ফর্স’ এবং ‘পাতালকন্যা মণিমালা’ দুটোই লোককাহিনি বটে, কিন্তু বিলিতি গল্পটি একটি ছোট গল্প আর দেশি কাহিনীটি গল্পের জটিলতা এবং চরিত্রের ও ঘটনার সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা হলেও ‘নভেল’-ধর্মী। ওপরে বিন্যস্ত সক্রিয়মূল এককগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, মূল যে গল্পটি আছে ১-৬ এবং ২১-২৩ সংখ্যক ফাংশনাল ইউনিট অবলম্বন করেই গঠিত এবং সাব-গল্পটি ১ বছর ব্যাপ্ত আর ৭-২০ সংখ্যক এককগুলি নিয়ে তৈরি। এই দুটি পর্যায়কে জড়িয়েই তৈরি হয়েছে কাহিনিটি। এমন জটিল বিন্যাস কিন্তু পাশ্চাত্যের ফেয়ারি টেল- মার্শেন-ভোকস ডিখটুং - বীলিনার প্রাপ্য নয়। এই বিন্যাসের এমন জটিল সংশ্লেষণ করার শৈলীটি বাংলা রূপকথার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সরল গল্পের গল্পও এখানে আছে। তাদের ফাংশনাল ইউনিটও একান্ত এদেশীয়। কিন্তু জটিল গল্পের ফাংশনাল ইউনিটের বিন্যাসের নিজস্বতা আছে একমাত্র বাংলার এই শ্রেণির লোককাহিনির।

এই আলোচনার মুখপাতেই একটা যে কথা বলেছিলুম লোককথায় শৈলীবিচারে ভঙ্গিমা নির্ভর এবং কখন নির্ভর এই দুটি প্রধান মাত্রা ছাড়াও আরও দুএকটা মাত্রাকে কখনও কখনও দেখা যায়, বিশেষত আমাদের রূপকথায়। তেমনই একটা মাত্রা হল গান আরেকটা হল ছড়া। যথাক্রমে ‘শিকলি’ এবং ‘শোলোক’ ও বলা হয় এদের। এই সুত্রেই আরও একটা কথা বলি : নির্ভেজাল লোককথা যা সংগ্রহ হয়েছে তার প্রধান ধারক ছিলেন গ্রামীণ বৃদ্ধারা—ঠাকুমা, দিদিমারাই। আঞ্চলিক গ্রাম্য উচ্চারণে বর্ণনা এবং গান (সেও আঞ্চলিক সুরেই) সহ যে কাহিনিগুলি মিলত, পরবর্তীকালে লিখিত চেহারা ধারণের সময় সেই একান্ত ঘরোয়া সাহিত্য ধারাটির আসলরূপটা প্রায় সময়েই হারিয়ে গেছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ‘ঠাকুমার বুলির’ ১ম সংস্করণের লিখিতভাবেই গ্রামীণ ভাষারূপটাকে মুদ্রিত চেহারা দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর থেকেই মূলত নাগরিক পড়ুয়াদের মুখ চেয়েই ভাষার সেই আঞ্চলিক মৌলিকতার বিলুপ্তি ঘটল কলকাতিয়া - ঘরোয়া ভাষায় পুনর্লিখিত হবার সময়ে। এই সমস্যাটা সর্বত্র ঘটেছে শুধু এদেশে নয় পাশ্চাত্যেও।

তাই আজ লোককথার শৈলী নিয়ে যে আলোচনাই করি না কেন তা কিন্তু অসম্পূর্ণই থাকে। এই দুঃখের কথাটুকু বলেই আপাতত “নটে গাছটি মুড়োই”!

উৎসসূত্র

১. Four Hundred Centuries of Cave Art; Abbe Henry Breuil (Montignac, 1952)
২. Native American Storytelling; ed.Karl Kroeber (Massachusetts, 1988), Pg 46

৩. বাঙ্গালীকি রামায়ণ : অযোধ্যাকাণ্ড
৪. A Siberian Narrator, The Study of Russian Folklore; M.K. Azadovsky (Moscow, 1960)
৫. The Types of Folktale; Anti Arne & Stith Thompson (Helsinki, 1961 edn)
৬. Introduction to the Study of Sign Language among the North Americans; G. Malery (Washington, 1881)
৭. লোককথার বর্ণমালা; সম্পা. সৌগত চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ২০১৪)
৮. The Club of Queer Trades; G. K. Chesterton (London, 1905)
৯. লোককথার সীমানা ও স্বরূপ; পল্লব সেনগুপ্ত (কলকাতা, ২০১৭)
১০. Epic Laws of Folk Narrative, A. Olrik; The Study of Folklore; Ed. Alan Dundes (Indiana, 1968)
১১. Morphology of Folktale; V. Propp (Indiana, 1968)
১২. বাংলা লোককথার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; রীতা ঘোষ (কলকাতা, ১৯৯৮)
১৩. Grimms Fairy Tales; J. Grimm, W. Grimm (Boston, 1896 edn)
১৪. ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (কলকাতা, ১৯০৬)

লেখক পরিচিতি :

উপদেষ্টা, কলকাতা সোসাইটি ফর এশিয়ান স্টাডিজ, চেয়ারম্যান, স্টেট রিসোর্স সেন্টার, পশ্চিমবঙ্গ। প্রাক্তন বিদ্যাসাগর অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, প্রাক্তন সভাপতি, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।